তসলিমা নাসরিন

নাইপলের উন্নাসিকতা

ভারতের বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত যে লেখকরা ইংরেজিতে উপন্যাস লেখেন, তাদের লেখা নিয়ে উচ্ছ্বাসের শেষ নেই এ দেশে। উপন্যাস পাঠযোগ্য না হলেও 'আহ দারুণ দারুণ' বলার যথেষ্ট লোক এখানে মেলে। কারণ একটিই, ইংরেজি ভাষাটির প্রতি অন্ধ অনুরাগ। যেন ইংরেজিতে কথা বলতে আর লিখতে পারলেই একটা সাংঘাতিক কিছু, প্রকাণ্ড কিছু, বিরাট কিছু হয়ে গেল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলায় বা অন্য ভারতীয় ভাষার তুলনায় অনেক লেখকই অনেক ভাল উপন্যাস লেখেন। কিন্তু ইংরেজি নয় বলেই সেসব লেখকের সেসব অসাধারণ উপন্যাস ভারতের গণ্ডির বাইরে বেশি কোথাও যায় না বা যেতে পারে না। ভিএস নাইপলের 'ম্যাজিক সিডস' (পিকাডর) নামের উপন্যাসটি যদি বাংলায় লেখা হতো এবং লেখকের নাম যদি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাইপল না হতো, কেউ পুছতও না। আর ইংরেজিতে যারা লেখেন, তাদের লেখার প্রেক্ষাপট যদি পশ্চিমের বদলে পুব হয়, চরিত্রগুলো যদি খানিকটা অচেনা অচেনা হয়, সংস্কৃতি যদি কিছু এক্সোটিক হয় তবে আর কথাই নেই। পোস্টকলোনিয়াল লিটারেচারের ভীষণ ডিমান্ড এখন।

নোবেল পুরস্কারের একশ' বছর পূর্তি উপলক্ষে সুইডেনের স্টকহোল্‌ম শহরে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নিয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠান হয় ২০০১ সালের শেষ দিকে। গুন্টার গ্রাস, নাদিন গর্ডিমার, সিমুস হিনেয়ের সঙ্গে বিদ্যাধর সুরজপ্রসাদ নাইপলও ছিলেন। তিনিই একমাত্র সাহিত্যিক, যিনি আফগানিস্তানে আমেরিকার বোমা ফেলার পক্ষে ভয়াবহ সমর্থন জানিয়েছিলেন। নাইপল চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নেয়ায় বিষম বিশ্বাসী। কোন সুস্থ মানুষকে এমনভাবে সন্ত্রাসের পক্ষ নিতে আমি দেখিনি আগে। তিনি তার 'অ্যামঙ্গ দ্য বিলিভারস : অ্যান ইসলামিক জার্নি' (১৯৮১) আর 'বিয়ন্ড বিলিফ : ইসলামিক এক্সকারসান অ্যামঙ্গ দ্য কনভারটেড পিপলস' (১৯৯৮) বই দুটোতে ইসলাম সম্পর্কে বালখিল্য সব মন্তব্য করতে দ্বিধা তো করেনইনি, এমনকি এমনও বলেছেন, দেয়ার প্রবাবলি হ্যাজ বিন নো ইম্পিরিয়ালিজম লাইক দ্যাট অব ইসলাম অ্যান্ড অ্যারাবস। মধ্যপ্রাচ্যের শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে দেয়ার যে ষড়যন্ত্র করেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, দীর্ঘকাল ধরে নির্বিচারে শোষণ চালিয়ে গেছে, তেলের লোভে কামড়ে ধরেছে অন্য দেশের মাটি, যে কোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শরীরে আগুন ধরিয়েছে, সেক্যুলার মুভমেন্টকে নস্যাৎ করেছে, তা এডওয়ার্ড সাইদের চোখে পড়ে, নাইপলের চোখে পড়ে না। দুই লেখকের মধ্যে পুরো এক ভুবন তফাৎ। নাইপল ভাল লেখক হতে পারেন, তার লেখার ধরন আকর্ষক হতে পারে, কিন্তু তার দৃষ্টি খুব গভীরে খুব দূরে যেতে পারে না। তিনি যথেষ্ট যুক্তি না দেখিয়েই কটু মন্তব্যে পারদর্শী। এমনকি ভয়ংকর সব কথা দিব্যি উচ্চারণ করতে পারেন। এই তো সেদিন সেপ্টেম্বরে 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার সাক্ষাৎকারে বললেন, পৃথিবীর কিছু দেশকে ধ্বংস করে দেয়া উচিত। সৌদি আরব। ইরান।

উন্নাসিকতা তাকে বিবেকবুদ্ধিহীন করে তোলে। যে দেশে গুজরাটের মতো দুর্ঘটনা ঘটে, সে দেশে বেড়াতে এসে তিনি অনায়াসে সংখ্যালঘু মুসলমানের বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলতে দ্বিধা করেন না। ইংল্যান্ডে, যেখানে বর্ণবাদ, জাতপাত নির্মমভাবে বিরাজ করছে বাদামি আর কালো রঙের মানুষদের জীবননাশ করে দিচ্ছে, সেখানে বসে তিনি সাদা বর্ণবাদীদের মতোই মাল্টিকালচারালিজমের বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলেন। ইংল্যান্ডে অভিবাসীদের সম্পর্কে নাইপলের কথা : ওদের কোন অধিকার নেই বলার যে আমি এই দেশ চাই, আমি এই দেশের আইন এবং নিরাপত্তা চাই, কিন্তু আমি আমার মতো করে বাঁচতে চাই। গুজরাটি, মাদ্রাজি, বিহারি সংস্কৃতির চর্চা ওখানে চলবে না। যারা বাঙালি, তাদের বাঙালিত্ব বিসর্জন দিয়ে তিনি ইংরেজের সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বলছেন। নাইপল ভুলে যান পৃথিবীর ইতিহাসই এমন, খাদ্যের খোঁজে, জীবিকার খোঁজে উন্নততর জীবন লাভের আশায় মানুষ চিরকালই পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে মিশেছে। সংস্কৃতির যে বিবর্তন ঘটেছে, প্রতিনিয়ত ঘটছেই এবং এটিকে যে দাবিয়ে রাখার কোন উপায় নেই, তা শুধু নির্বোধরাই মানে না। নাইপল হয়তো ভুলে যান যে নিজে তিনি ত্রিনিদাদ থেকে ইংল্যান্ডে আসা ইমিগ্রান্ট। এতদিনে ইংরেজের চেয়ে বেশি ইংরেজ হয়েছেন, কিন্তু সবাই তা হয় না বা হতে চায় না। নাইপলের জেদ দেখে মনে হয়, স্বৈরাচারে বিশ্বাস তার, গণতন্ত্রে নয়। মানুষের ইচ্ছের শরীরে শিকল পরিয়ে দিতে তিনি মোটেও কুণ্ঠিত হন না, দেখে বিস্ময় জাগে। সম্ভবত দাসপ্রথাতেও তার খুব একটা আপত্তি নেই।

কালো আফ্রিকানদের কোন সংস্কৃতি নেই, বলেছেন নাইপল। তার এই অগভীর এবং অশালীন মন্তব্য বড় অশ্লীল শোনায়। কেবল আফ্রিকানদের ক্ষেত্রে নয়, জঙ্গল বা জংলি শব্দটি তিনি পুরো তৃতীয় বিশ্বের জন্য ব্যবহার করেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ক্যারিবিয়ান কবি ডেরেক ওয়ালকট বলেছেন, কালোদের সম্পর্কে নাইপল যে কুৎসিত মন্তব্য করেছেন তা যদি তিনি ইহুদিদের সম্পর্কে করতেন তবে ক'জন লোক তার এই বাকস্বাধীনতা সহ্য করত? নাইপলের দীর্ঘকালের বন্ধু পল থেরো তার বইয়ে নাইপল সম্পর্কে লিখেছেন, আমি তার ট্যালেন্টকে খুব অ্যাডমায়ার করতাম, আফটার অ্যা হোয়াইল আই অ্যাডমায়ার্ড নাথিং এলস। ফাইনালি আই বিগ্যান টু ওয়ান্ডার অ্যাবাউট হিজ ট্যালেন্ট, সিরিয়াসলি টু ওয়ান্ডার এবং সন্দেহ শুরু হল যখন তার শেষ বইটি পড়তে গিয়ে পৃষ্ঠা কেবল বাদ দিয়ে গিয়েছি। আগে হলে, মনে করতাম এ আমার দোষ। নাউ আই নিউ দ্যাট কুড বি মনোম্যানিয়াক ইন প্রিন্ট দ্যাট হি ওয়াজ ইন পারসন।

পুঁজিবাদে বিশ্বাসী মানুষ আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু নাইপলের মতো এত কঠোর পুঁজিবাদী কাউকে দেখিনি। তিনি ইউরোপের, ওয়েলফেয়ার স্টেটের তীব্র নিন্দা করেছেন। প্রতিটি নাগরিকের জন্য রাষ্ট্রের বিনা পয়সায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা, বেকার ভাতা, তার বিশ্বাস, মানুষ নয়, দৈত্য তৈরি করছে। নতুন প্রজন্ম হাত-পা গুটিয়ে এখন ওই সুবিধা পাওয়ার আশায় বসে থাকবে বলে তিনি মনে করেন। যার টাকা আছে, সে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুবিধা পাবে, সুখ, শান্তি, স্বস্তি পাবে, আর যার টাকা নেই সে কিছুই পাবে না, উদ্বাস্তু উন্মুল হয়ে জীবনযাপন করবে, ভুগে মরবে, পচে মরবে– এই হল আমাদের নোবেল বিজয়ীর বিশাল মস্তিষ্ক থেকে প্রসূত প্রণম্য প্রস্তাব!

প্রায় ৪৩ বছর আগে ছাপা হওয়া নাইপলের 'অ্যা হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস' বইটির মান এ বছরের ম্যাজিক সিডসের চেয়ে উন্নত ছিল। লেখকের লেখার মান যদি দিন দিন উপরে না উঠে নিচের দিকে নামে, নামতেই থাকে, তবে আশংকা হয় লেখক হিসেবে তার হয়তো দেয়ার আর কিছু নেই। ম্যাজিক সিডস উপন্যাসটি আত্মপরিচয় এবং আদর্শ নিয়ে, যে দুটো বিষয় জীবনকে গড়ে তোলে বা ধ্বংস করে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র উইলি চন্দ্রনকে আমরা প্রথম দেখি 'হাফ অ্যা লাইফ' উপন্যাসে যেটি বছর তিনেক আগে প্রকাশ পেয়েছিল। নাইপল অবশ্য অস্বীকার করেছেন, হাফ অ্যা লাইফ বইটির সঙ্গে ম্যাজিক সিডসের কোন সম্পর্ক নেই। উইলির জন্ম ভারতে, তিরিশের দশকে। ভারত থেকে তিনি এক সময় লন্ডন পাড়ি দেন। ওখানে গল্পের একটি বই বের করেন, আনা নামের এক মেয়েকে বিয়ে করে আফ্রিকায় চলে যান। যৌনজীবনের আকর্ষণই তার কাছে তখন প্রধান ছিল। নীচু জাতের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য তাকে নানা ঝুটঝামেলা পোহাতে হয়। নিজের পরিবেশ আর বাবার মতের বিরুদ্ধে যাওয়া উইলি এখন বউ ছেড়ে, আফ্রিকার জীবন ছেড়ে ইউরোপে চলে এসেছেন, ম্যাজিক সিডসে এসে বার্লিন শহরের রাস্তায় গোলাপ বিক্রি করছেন অস্ত্র কিনবেন বলে। বোন সরোজিনিই উইলিকে উদ্বুদ্ধ করেন ভারতের বিপ্লবী দল কান্দাপল্লীতে ভিড়তে। এ বইতে উইলিকে ইউরোপ থেকে ভারতে যেতে দেখি। ভারতের মাওবাদী সন্ত্রাসী দলে যোগ দিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে দেখি। অস্পৃশ্যদের পক্ষে বিপ্লব করতে গিয়ে উইলি নানারকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। কয়েক বছর জেলও খাটেন এবং এক সময় তার মনে হয় এই বিপ্লব আসলে অর্থহীন। এই বিপ্লব গ্রামের নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্ণের মানুষের জন্য, যাদের জন্য আমরা বলি আমরা লড়াই করছি, সত্যিকার কিছুই করতে পারে

হ্যাভ অ্যান আইডিয়াল ভিউ অব দ্য ওয়ার্ল্ড। কেন ভুল, কী কারণ, কিছুরই ব্যাখ্যা তিনি দেননি। বিপ্লবে আস্থাহীন উইলি ফিরে যান লন্ডনে। ওখানেই তিনি জীবনের মানে খুঁজে পান। নাইপলের ক্ষুদ্র খাঁচায় বন্দি উইলি, খুব বেশিদূর তিনি যেতে পারেন না। খুব বেশি কিছু ভাবতেও পারেন না। দেখে-শুনে যে কারোর মনে হতে পারে সে-ও খাঁচায় বন্দি। থেকে থেকে বইটি বন্ধ করে শ্বাস নিতে হয় মুক্ত হাওয়ার। ম্যাজিক সিডস পুরনো সব দর্শনে ভরপুর। নাইপলের বয়স এখন বাহাত্তর, সম্ভবত বয়স হলে চারদিক যখন ভেঙে পড়তে থাকে, দর্শনই ভরসা। জেলের দেয়াল লিখন পড়িয়ে তিনি তার উইলিকে শেখান, ট্রুথ অলওয়েজ উইনস, অ্যাঙ্গার ইজ অ্যা ম্যান'স গ্রেটেস্ট এনিমি, টু ডু গুড ইজ দ্য গ্রেটেস্ট রিলিজন, ওয়ার্ক ইজ ওয়রশিপ, নন-ভায়োলেন্স ইজ দ্য গ্রেটেস্ট অব অল রিলিজনস।

বইয়ের দীর্ঘ দীর্ঘ সংলাপ পড়তে পড়তে মনে হয় বুঝি বাচালের রাজ্যে এসে পড়েছি। কী জানি স্ত্রী নাদিরার বেশি কথা বলার রোগ দেখতে দেখতেই বোধহয় নাইপল তার চরিত্রদের বাচাল বানিয়েছেন। তার আগের বইগুলোয় যা আছে, যা পড়ে তাকে পাঠক বাহবা দিত, সেসব নেই এই বইয়ে, শ্লেষ নেই, ধারালো ছুরির মতো শব্দ নেই, বাক্য নেই। তার গদ্যে এখন পুনরাবৃত্তি, অতিকথন, তার গদ্য এখন ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বলেই নাইপল যদি ভেবে থাকেন যা ইচ্ছে তা-ই লিখেই পাঠককে তুষ্ট করতে পারবেন, তবে ভুল। জীবন নিয়ে এখন যদি তিনি সিরিজের তৃতীয় উপন্যাসটি লেখেন, আমার মনে হয় না পাঠক খুব জানতে আগ্রহী হবে উইলি কেমন আছে, কী করছে। উইলি এমন একটি চরিত্র যে পাঠককে আকর্ষণ করে না, পাঠকের মনে কোন কৌতূহল জাগায় না। সে সহজেই অনুমান করে নিতে পারে যে সত্তরোর্ধ্ব উইলি এখন লন্ডনের কাছে কোন ছোট শহরের কোন ছোট বাড়িতে বসে ছোট ছোট গল্প-উপন্যাস লিখছেন আর নিজের ছোটখাটো ভারি শরীরটিকে লাঠিতে ভর করিয়ে এনে লনের চেয়ারে বসিয়ে দিচ্ছেন। বিকালে চা খেতে খেতে প্রায় বোজা চোখে কাউকে দেখছেন তিনি। কথা বলছেন অসাম্যের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদের বিপক্ষে, গালাগালি দিচ্ছেন পৃথিবীর সব বিপ্লবকে। ধনী এবং শক্তিমানের গুণগান গাইছেন। সন্ধ্যা নেমে এলে স্ত্রী পাশে এসে বলছেন, উইলি, ঘরে চল, এখন বিশ্রাম না নিলে শরীর খারাপ করবে। উইলি ওঠেন, স্ত্রীকে ক্রাচের মতো ব্যবহার করে তিনি ঘরের দিকে হেঁটে যান।

বিদেশী পত্রিকা থেকে

ইতিহাস ব্লেয়ারকে ক্ষমা করবে

টেমস নদীর তীরে

গোলাম কাদের

ইরাকের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র সংক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারের রিপোর্ট ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে করা হয়েছে বলে বিবিসি দাবি করেছিল। সরকার বলেছিল, সেটা ঠিক নয়। ওই বিতর্কে বিবিসি চেয়ারম্যানের পদত্যাগের পর ডিরেক্টর জেনারেল গ্রেগ ডাইকও পদত্যাগ করেন। টনি ব্লেয়ারের চাপে পদত্যাগের সময়ে তিনি বলেছিলেন, হাটন রিপোর্ট সম্বন্ধে তিনি পরবর্তী সময়ে মন্তব্য করবেন। তাই করলেন। সম্প্রতি তিনি যে স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন তাতে নতুন করে বিতর্কের ঝড় তুলে বলেছেন, ইরাক যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে ব্লেয়ার ব্রিটিশ জনগণকে ধোঁকা দিয়েছেন। মি. ডাইক বিবিসির রেডিও ফোর-এর বিতর্কিত টুডে নামে সাময়িক প্রসঙ্গের অনুষ্ঠানের ওই রিপোর্টের পক্ষে কথা বলেন যেটা বিবিসি আর প্রধানমন্ত্রীর ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের দফতরের মধ্যে তিক্ত লড়াই সৃষ্টি করেছিল, যার শোচনীয় পরিণতিতে ব্রিটিশ অস্ত্রবিশারদ ডেভিড কেলির কথিত আত্মহত্যা ঘটেছিল।

গ্রেগ ডাইক তার স্মৃতিকথায় খোলাখুলিভাবে ব্লেয়ার, তার কমিউনিকেশন্স ডিরেক্টর এলিস্টার ক্যাম্পবেল আর লর্ড হাটনের তীব্র সমালোচনা করেন। ডাইক বলেন, 'ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ অত্যন্ত প্রবল। তিনি হয় অকর্মণ্য এবং একটা ভুল মিথ্যা বলেছিলেন যখন তিনি হাউজ অব কমন্সে বলেন যে তিনি জানতেন না ৪৫ মিনিটের দাবি করার তাৎপর্য কি।' ডাইক বলেন, 'আমাদের সবাইকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। ইতিহাস ব্লেয়ারের পক্ষে যাবে না। ইতিহাস তাকে ক্ষমা করবে না বরং দেখাবে যে গোটা ব্যাপারটা (ইরাক যুদ্ধের ব্যাপার) একটা বিরাট রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি।'

মি. ডাইক ও বিবিসির চেয়ারম্যান গ্যাভিন ডেভিসকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়, যখন সরকারের অস্ত্রবিশারদ ডেভিড কেলির মৃত্যুর ব্যাপারে হাটন রিপোর্টে বিবিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দারুণ সমালোচনা করা হয়।

ওই দিনগুলোর স্মৃতিকথায় ডাইক বলেন, 'আমি চার বছর ধরে একটা দারুণ সমস্যাগ্রস্ত সংস্থাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য দিনরাত কাজ করলাম এবং এখন যেসব লোককে আমি সবচেয়ে কম সম্মান করি অর্থাৎ কিনা সরকারি লোকজন, তারাই আমাকে বের করে দিল। সরকার সমর্থকরাই আমার মতো আধুনিকপন্থীকে রাখল না। বলা যায়, অনেক দিক দিয়ে এটি ছিল একটা খাঁটি ব্রিটিশ ক্যু।'

সরকারের সঙ্গে বিরোধের ওই কেলেঙ্কারির ঘটনায় বিবিসির চেয়ারম্যান যখন পদত্যাগ করেন তখন বিবিসির গভর্নররা তাকে সমর্থন না দেয়াতে ডাইক তার স্মৃতিকথায় তাদের কঠোর সমালোচনা করেন। ডাইক বলেন, 'ওরা যেন মোটরগাড়ির হেডলাইটের চোখ-ধাঁধানো আলোয় ভয় পাওয়া খরগোশের মতো আচরণ করছিল।' বিবিসির যে কয়জন গভর্নর তার পদত্যাগের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, তাদেরই এখন পদত্যাগ করতে তিনি আহ্বান জানান।

আর তিনি ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, প্রধানমন্ত্রী ইরাক যুদ্ধকে সমর্থন করার জন্য বিবিসিকে তার ভাষায় 'বুলি' করেছিলেন অর্থাৎ মাস্তানি করেছিলেন।

হাটন রিপোর্ট প্রকাশের পর ব্লেয়ার নাকি বিবিসির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে, ডাইকের ভাষায়, 'কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন।' ডাইকের বইতে বলা হয়, ব্লেয়ার কৌশলে চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি যে কারোর পদত্যাগ চান না বলে আগে যেমনটা বলেছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি রাখার জন্য কিছুই করেননি। ডাইক বলেন, 'আমি দেখলাম ক্যাম্পবেল আমাদের মিথ্যাবাদী বলছিল এবং পদত্যাগের দাবি তুলছিল। আমি ধরে নিয়েছিলাম ব্লেয়ার ইচ্ছা করেই আমাদের দিকে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন।'

ব্লেয়ারের সাবেক কমিউনিকেশন্স ডিরেক্টর এলিস্টার ক্যাম্পবেলকেও ডাইক ছাড়েননি। তিনি অভিযোগ করেন, ক্যাম্পবেল ডাউনিং স্ট্রিটের দফতরকে রিচার্ড নিক্সনের আমলের হোয়াইট হাউসে পরিণত করে ফেলেছিলেন। বিবিসির কর্মকর্তাদের পদত্যাগ করা উচিত বলে ক্যাম্পবেল যে ওই সময় দাবি তুলেছিলেন তার জন্য ডাইক তাকে 'একজন মাথার ব্যারামগ্রস্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ জারজ সন্তান' বলে বর্ণনা করেন।

গ্রেগ ডাইক তার পদত্যাগের এতদিন পর এসব খারাপ খারাপ কথা খোলাখুলি বলে যে নতুন করে ঝড় তুলেছেন তাতে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ডাউনিং স্ট্রিটের দফতর থেকে বিস্তারিত মন্তব্য করতে অস্বীকার করা হয়। বিবিসির পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে এ পর্যন্ত কিছু বলা হয়নি। আর ক্যাম্পবেলও চুপচাপ আছেন। ডাউনিং স্ট্রিটের একজন মুখপাত্র কেবল এটুকু বলেন, 'মিঃ ডাইকের মতপ্রকাশের অধিকার আছে। তাতে আমরা একমত নই, কিংবা যে চারটা বিস্তারিত তদন্ত হয়েছে সেগুলোতেও তার মতের সঙ্গে মিল দেখা যায়নি।'

তবে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবিন কুক, যিনি ইরাক যুদ্ধের ইস্যুতে হাউজ অব কমন্সের লিডারের পদ থেকে ইস্তফা দেন, তিনি বলেন, 'এটা সুস্পষ্ট যে সরকার আশা করছে ইরাক ইস্যুটা চলে যাবে আর তাদের জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করবে না। ওরা যে এই নতুন বিতর্কে যেতে চাচ্ছে না তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এতে তারা জিতবে বলে তাদের বিশ্বাস নেই।'

বিবিসির সাবেক মহাপরিচালকের স্মৃতিকথার বিতর্কে অবশ্য পত্রিকাওয়ালারা বিস্তৃতভাবে সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছে।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলেছে, ইরাক যুদ্ধের খবর পরিবেশন নিয়ে বিবিসি আর সরকারের মধ্যে যে তিক্ত বিরোধ হয়েছিল সাবেক মহাপরিচালকের স্মৃতিকথায় সেটা নতুন করে শুরু হল।

পত্রিকা লিখেছে, 'ব্রিটেনকে যে একটা অজনপ্রিয় যুদ্ধে ঠেলে দেয়া হয়েছে সেই রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্তের ব্যাপকতাই তার স্মৃতিকথার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। মি. ডাইকের বিবরণ এখনও স্তম্ভিত করার মতো। প্রধানমন্ত্রী যে তাকে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে বিবিসির ইরাক যুদ্ধের খবর পরিবেশনের সমালোচনা করেন সেটা বিবিসির অমূল্য স্বাধীনতার ওপর সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের শামিল– আর এই অভিযোগের জবাব টনি ব্লেয়ারকে দিতে হবে।'

ডেইলি টেলিগ্রাফ লিখছে, 'ইরাক যুদ্ধের ব্যাপারে বিরোধ বাধার আগ পর্যন্ত সরকার ও বিবিসির মধ্যে যে দারুণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সেটাই মি. ডাইকের বইতে উদঘাটিত হয়েছে। এই স্মৃতিকথা শুধু বিবিসির প্রতি নিউ লেবার সরকারের আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই নয়, একজন লেবার সমর্থকেরও আর্তনাদ যে তার মতে মি. ব্লেয়ার যথেষ্ট বামপন্থী নন।'

টেলিগ্রাফ আরও বলছে, মি. ডাইকের কাছে চিঠিতে বিবিসির নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর নিজের সন্দেহই এই স্মৃতিকথায় স্পষ্ট হয়েছে।

মিরর লিখেছে, 'মি. ডাইকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে বলে তার মনে করার অধিকার আছে। যদিও তিনি লেবারের প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে, তাকে মহাপরিচালকের পদ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মি. ডাইক সত্যি কথা বলার জন্য তার চাকরি হারিয়েছেন কিন্তু যারা মিথ্যা কথার ঝুড়ির আড়ালে দেশকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেছে তাদের চাকরি বহাল আছে।'

স্কটসম্যানের মন্তব্য হল, 'মি. ডাইকের মতো এই পত্রিকাও সাদ্দাম হোসেনের উৎখাতকে সমর্থন করেছিল, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীতে দেখা গেছে যে সরকার সামরিক গোয়েন্দা তথ্য ছাড়াই কাজ করেছে এবং প্রায় সময়ই সামরিক পেশাদারদের ভাল পরামর্শের চেয়ে রাজনৈতিক প্রয়োজনের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর মি. ক্যাম্পবেল যে বিবিসির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার অভিযান চালিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল কর্পোরেশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষভাবে খবর পরিবেশনে ব্যাঘাত ঘটানো। এই অভিযানের কাছে বিবিসির গভর্নররাই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করেন। এখন বিবিসি হয়তো তাদের অনুষ্ঠানের মান বাড়াতে চাইছে কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না যদি তাদের সাংবাদিকতার স্বাধীনতাই হরণ করা হয়।'

আর ডেইলি মেইল লিখেছে, 'মি. ব্লেয়ার আর মি. ক্যাম্পবেল যথার্থ সমালোচনা কিভাবে রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন মি. ডাইকের স্মৃতিকথায় সেটাই প্রকাশ পেয়েছে। আর তিনি যে প্রধানমন্ত্রীকে 'বিশ্বাস করার মতো কেউ' বলে মনে করেন না বলে মতপ্রকাশ করেছেন সে কথা তার মতো এককালে মি. ব্লেয়ারের একজন বন্ধু, মিত্র আর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে আসাটা আরও নিদারুণ ব্যাপার। বিবিসির বিরুদ্ধে মূল হামলাকারী মি. ক্যাম্পবেল আর তার পদে নেই। কিন্তু যতদিন মি. ব্লেয়ার নিজের পদে আছেন, ততদিন আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের সততার প্রতি বিশ্বাস সবচেয়ে নিচে থাকবে।'

গ্রেগ ডাইকের স্মৃতিকথা অনেক তিক্ততায় ভরা হলেও নিউ লেবারের ও ব্লেয়ারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিহাসে এক চমকপ্রদ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অলিম্পিক বিজয়ী আমির খানের ফ্যামিলির 'টেবিট টেস্ট'-এ পাস?

টেলিগ্রাফের কমেন্ট-এর পাতায় ভিকি উডস্ ব্রিটেনের এবারের অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে কমবয়সী অথচ সাহসী অংশগ্রহণকারী বক্সিংয়ে রুপার মেডেল বিজয়ী আমির খানের বিষয়ে কিছু আগ্রহব্যঞ্জক কথাবার্তা লিখেছেন।

তার প্রবন্ধের শিরোনাম দেয়া হয়েছে : 'আমির খান'স ফ্যামিলি শো আপ দ্য টেবিট টেস্ট'।

ভিকি উডস লিখেছেন, মহিলা হিসেবে তিনি বক্সিংয়ের প্রতি (হেভিওয়েট বক্সিং বাদে) তেমন আগ্রহী নন। তবে আমির খানের প্রতি তার আগ্রহ জন্মেছে কয়েকটা কারণে। এক হল তিনি নিজে উত্তর-পশ্চিম ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাস্টার এলাকার বাসিন্দা আর আমির খানও সেই এলাকার পাকিস্তানি ইমিগ্রেন্ট পরিবারের ছেলে। আর সেজন্য আমিরের ইংরেজি কথাবার্তার একসেন্ট তার অঞ্চলের বলে তিনি বেশ চমৎকৃত হয়েছেন বলে লিখেছেন।

ভিকির দ্বিতীয় চমৎকৃত হওয়ার বিষয় হল তার মনে হয়েছে যে ভয় নামে বস্তুর সঙ্গে আমির খানের পরিচয় নেই। অলিম্পিকের ফাইনালে ৮০ কেজি ওজনের গ্রুপে ১৭ বছর বয়সী আমির খান যে রকম সাহস দেখিয়েছেন সেটা মুগ্ধ হওয়ার মতো।

আরেকটা কারণ হল আমির খানের বাবা যে রকম (ব্রিটিশ) দেশপ্রেম ও গর্বের সঙ্গে তার ছেলের পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন সেটাও চোখে পড়ার মতো।

সাবেক টোরি মন্ত্রী নরম্যান টেবিট ৮০-র দশকে 'ক্রিকেট টেস্ট' নামে ইমিগ্র্যান্টদের দেশপ্রেম পরীক্ষার এক অভিনব উপায়ের কথা বলেছিলেন। তার বক্তব্য ছিল পাকিস্তানি ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকজন ব্রিটিশ নাগরিক হলেও ব্রিটেনের জন্য তাদের সত্যিকার দেশপ্রেমের পরীক্ষা তখনই হয় যখন ইংল্যান্ড আর পাকিস্তান বা ভারতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে খেলা হয়। মি. টেবিটের মতে, ওরা ইংল্যান্ডের বদলে নিজেদের আগের দেশের টিমকেই সাপোর্ট করে আর সেখানেই ওরা দেশপ্রেমের পরীক্ষায় ফেল হয়ে যায়। পরবর্তীকালে 'ক্রিকেট টেস্ট' কথাটা 'টেবিট টেস্ট' নামে পরিচিতি লাভ করে।

রাজনীতিকরা ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদকে এত বিরাট এক সেন্টিমেন্ট হিসেবে দেখান যে তাতে তাদের স্বার্থসিদ্ধি হয় কিন্তু আসলে তার মধ্যে সারবস্তু নেই। কথায় কথায় রাজনীতিকরা সস্তা জাতীয়তাবাদের ধোয়া তোলেন কিন্তু আসলে তাদের উদ্দেশ্য যে ক্ষমতা হাসিল সেটা তো সবাই জানে।

ভিকি তাই লিখেছেন, ল্যাঙ্কাস্টারে জন্ম হওয়া পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত আমির খান যখন প্রায় সোনার মেডেল পাওয়ার পথে ছিল তখন কি তাকে জিজ্ঞাসা করা যেত যে সে কার পক্ষে, কাকে সাপোর্ট করে? ভিকির মতে, এটা যেন একটা বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করা, 'তুমি কাকে বেশি ভালবাস– বাবা না মাকে? যেন বাবা-মা দু'জনকেই একই মাত্রায় ভালবাসা যায় না! দ্বৈত আনুগত্য কি হয় না?'

তবে আমির খানের পরিবার ওই ক্রিকেট (টেবিট) টেস্টের পরীক্ষায় যে সম্মানের সঙ্গে পাস করেছে সে সম্বন্ধে ভিকির কোন সন্দেহ নেই। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে আমিরের বাবা তার পাকিস্তানি ডিজাইনের শার্টের ওপর ইউনিয়ন জ্যাক পতাকার ওয়েস্টকোট পরেছিলেন আর তার সালোয়ার-কামিজ পরা মা আর ছোটবোন পাকিস্তানি ও সেই সঙ্গে ব্রিটিশ পতাকাও হাতে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন।

ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে আর দ্বৈত নাগরিকত্বের আনুগত্যের পরীক্ষায় তারা যথার্থভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলতে হবে।

আমির খানের শহর বোল্টন ইভনিং নিউজ পত্রিকায় একজন স্থানীয় ইংরেজ লিখেছেন যে টেলিভিশনের পর্দায় আমির খানের বাবা সাজ্জাদ ও তার ইউনিয়ন জ্যাক ফ্ল্যাগের ওয়েস্টকোট পরা ছবি গত কয়েকদিনে যে পরিমাণ বর্ণ-সম্প্রীতির মনোভাব সৃষ্টি করেছে সে রকম রেস রিলেশনস্ বোর্ড ও তাদের সমর্থকরা গত ৪০ বছরেও করতে পারেনি।

শনিবার বোল্টনে আমির খানের জন্য নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। কারণ আমির খান এখন বোল্টনের বিখ্যাত নাগরিকদের মধ্যে একজন। আমির খানকে এখন ব্রিটিশ-এশিয়ান তরুণদের জন্য এক ধরনের রোল মডেল বলা যায়।

কিন্তু তাহলে 'পাকি' কথাটা কি বর্ণবিদ্বেষী বিএনপির সমর্থকরা বলা ছেড়ে দেবে? আর টোরিদের 'টেবিট টেস্ট' কথাটা লোপ পেয়ে যাবে? আপনাদের কি মনে হয়?

ম নি রু জ্জা মা ন ম নি

বাজেট ও ওষুধ সংকট

'যদি হয় যক্ষ্মা তবে নাই রক্ষা।' এই প্রচলিত কথাটি এক সময় সত্য হলেও বর্তমানে এটি অচল। এমন একটা সময় ছিল যখন যক্ষ্মার কোন এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ও ওষুধ ছিল না। কাশি-রক্তবমিতে যন্ত্রণাকাতর রোগীর মৃত্যুই ছিল একমাত্র পরিত্রাণের

উপায়। যক্ষ্মা ধরা পড়লে রোগীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ম্যানেটরিয়ামে পাঠিয়ে প্রায় সমাজবিচ্ছিন্ন করে রাখা হতো, যাতে রোগ সমাজে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। মৃত্যুপথযাত্রী যন্ত্রণাকাতর একজন মানুষকে সমাজচ্যুত করার মতো নির্মমতার এখন আর প্রয়োজন নেই। কারণ ওষুধের গুণে যক্ষ্মা এখন নিরাময়যোগ্য। বাংলাদেশেও যক্ষ্মার ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে কিনা অথবা পাওয়া গেলেও রোগী কিনতে পারবে কিনা– এমন একটা আশংকা সৃষ্টি হয়েছে বলেই অতীতের যক্ষ্মা রোগীর নির্মম পরিণতিকে স্মরণ করতে হচ্ছে।

আশংকার কারণটি এবার ভেঙে বলি। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে যুগান্তরে খবর প্রকাশ– 'আমদানি শুল্ক আরোপ : জীবন রক্ষাকারী ওষুধ সংকটের আশংকা।' সংবাদে যেসব রোগের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সবই প্রাণঘাতী ভয়ংকর রোগ। ক্যান্সার, হৃদরোগ, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, কিডনি ডায়ালাইসিসের ওষুধের আমদানির ওপর ৭.৫ শতাংশ শুস্ক ও ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর বসানো হয়েছে। ফলে এসব রোগের ওষুধের মূল্য গড়ে ২৫-৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

স্বাস্থ্য পরিচর্যায় খরচ বাড়ছে কিংবা ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে– এমন কোন বিষয় আমাদের সমাজে সাধারণত প্রাধান্য পায় না। যেমনটি ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্র নীতির পরই স্থান পায় স্বাস্থ্য খাত। ব্রিটেনসহ আরও অনেক উন্নত দেশেও স্বাস্থ্য খাতের প্রাধান্য অনেক বেশি। ওইসব দেশে স্বাস্থ্য খাতে পান থেকে চুন খসলে নির্বাচনে সরকারি দলকে ভাল খেসারত দিতে হয়।

পক্ষান্তরে আমাদের সরকারের কি অপূর্ব সুবিধা! জনগণের সুযোগ-সুবিধা কিংবা সরকারের কোন কাজের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবতে হয় বলে মনেই হয় না। অর্থমন্ত্রী চলতি অর্থবছরের বাজেটে জীবনরক্ষাকারী ওষুধ আমদানির ওপর ২৫-৩০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি করে সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। এর ভেতর দিয়ে হয়তো তার ব্যক্তিগত অনমনীয়তা ও পরাক্রমের ঝাণ্ডা উড্ডিন হয়েছে আরও ঊর্ধ্বে। কিন্তু দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার বারোটা বাজছে কিংবা সোজাসুজি বললে রোগী চিকিৎসায় ওষুধ পাবে না বা ওষুধ কিনতে প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি হবে– এমন কোন বিষয় তার কাছে প্রাধান্য পায়নি। এসব বিষয় যে সরকারের বিবেচ্য নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক কর্মকর্তার ভাষ্যে– 'জীবন রক্ষাকারী ওষুধের ওপর থেকে ভ্যাট ও আমদানি শুল্ক প্রত্যাহারের কোন চিন্তাভাবনা তাদের নেই' (যুগান্তর, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪)। চিকিৎসা ব্যাহত হবে, রোগীর কষ্ট বাড়বে ইত্যাকার পরিণতির প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নেতিবাচক মনোভাব দেখান তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, সরকার কি জনগণের চিকিৎসা পাওয়ার সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারকে তোয়াক্কা করে না? স্মরণ করা যেতে পারে, স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে, প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার আগেকার শাসনামলসহ এই গত বছর পর্যন্ত ক্যান্সার, হৃদরোগ, যক্ষ্মা, কুষ্ঠসহ প্রাণঘাতী রোগের ওষুধ আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন করমুক্ত ছিল। এর সুফল পেয়েছে দেশের স্বাস্থ্য খাত এবং রোগীরা। চিকিৎসকগণ দেশেই এসব রোগের চিকিৎসায় হাতের কাছে পেয়েছেন অত্যাধুনিক ওষুধ যা ছিল রোগীর ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে। চিকিৎসা ব্যবস্থা ও রোগীর পরিণতির তোয়াক্কা না করে স্বাধীনতার এত বছর পর জীবনরক্ষাকারী ওষুধের ওপর শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বসিয়ে অর্থমন্ত্রী যে বিক্রমের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তাকে বাহবা ও সাধুবাদ দুটোই দেয়া যেত। কিন্তু সমস্যা বেধেছে কর্মের পরিণতি নিয়ে। ওষুধের মূল্য বাড়ছে ২৫-৩০ শতাংশ, এটিও না হয় কুইনাইনের মতো গলাধঃকরণ করা যেত এই ভেবে যে, বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে এটাই তো স্বাভাবিক। এই যুক্তিও হজম করা মুশকিল। কারণ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সুযোগ্য কর্মকর্তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক কর্মকর্তা অদ্ভুত যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন– 'ধনীরা ওষুধ আমদানি করবেন, তাহলে তারা ভ্যাট ও আমদানি শুল্ক দেবেন না কেন?' প্রশ্ন জাগে অসুখ কি কেবল বেছে বেছে ধনীদের হবে যারা ওষুধ আমদানি করতে পারবে? গরিবের কি অসুখ হয় না বা হলে তার কি ওষুধের দরকার হবে না?

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া ১৯৯৪ সালে দেশীয় শিল্প সহায়ক নীতি প্রণয়ন করেন। নীতিটি হল দেশে উৎপাদিত ওষুধ আমদানি করা যাবে না। এটি শুধু শিল্প সহায়ক নয় জনকল্যাণমুখীও বটে। কারণ দেশে উৎপাদিত ওষুধ সুলভ হয়। বর্তমানে আমদানি হয় কেবল ওইসব ওষুধ যা দেশে উৎপাদন হয় না অথবা চিকিৎসায় অত্যাবশ্যক এবং যার বিকল্প নেই। অর্থমন্ত্রী অত্যাবশ্যক ও আমদানির বিকল্প নেই এমন ওষুধের ওপর নজিরবিহীনভাবে শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বসিয়ে দেশের শিল্পায়নের বা চিকিৎসার কি সুবিধা করলেন তা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না। তবে এ জিনিসটি কিছুটা আঁচ করছি যে, মূল্যবৃদ্ধির কারণে নকল, ভেজাল, নিম্নমানের ওষুধ আশপাশের দেশ থেকে ব্যাপকভাবে কালোবাজারি হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ওষুধের মূল্যবৃদ্ধিতে চিকিৎসা ব্যাহত হবে বলে এক সময় মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব নাকচ করেছে। এর নজির আছে। অতীতে যদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চিকিৎসা সুবিধা বিবেচনা করে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা করে থাকে, তবে অর্থমন্ত্রীর এই ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করছে না কেন? স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মূল্যবৃদ্ধির আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছে, নাকি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দাপটের কাছে অসহায়?

এমনিতেই দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ ইত্যাদিতে আমাদের দেশ থেকে বহু রোগী আশপাশের দেশগুলোতে অহরহ যাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির কারণে এ প্রবণতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে কেউ কেউ মনে করছেন। যদি তাই হয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাকে দোষারোপ করবেন– চিকিৎসক, রোগী নাকি অর্থমন্ত্রীর বাজেটকে?

পরিশেষে বলে রাখা ভাল, আমদানিকৃত ম্যালেরিয়ার ওষুধের মূল্যও এ কারণে ২৫-৩০ শতাংশ বাড়ছে। সাধারণত ম্যালেরিয়া পাহাড়ি এলাকায় বেশি হয়। এসব এলাকার মানুষ গরিব। আগে যা হওয়ার হয়েছে। এখন ঘটি-বাটি বেচে ওষুধ খেয়ে সেরে উঠবেন হয়তো, তবে সারা জীবন ঘটি-বাটি বিক্রির তেঁতো সাধটি হৃদয়ে বয়ে বেড়াতে হবে। অর্থমন্ত্রী কি দয়াপরবশ হয়ে ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির এ কুইনাইনটি থেকে রোগীকে মুক্তি দেবেন?